প্রস্তাবনা

স্বাধীনতা-পরবর্তী পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের ইতিহাসে বিশ শতকের সাতের দশক নানা দিক থেকে আলোচনা, বিতর্ক ও কৌতূহলের অবকাশ রাখে। এই সময়ের রাজনৈতিক সংঘাত, অর্থনীতির অবনমন, সামাজিক স্তরের বিশৃঙ্খলা তৎকালীন জনজীবনকে অন্ধকার কুহকে নিক্ষেপ করেছিল। কেন্দ্রীয় রাজনীতিতে ইন্দিরা গান্ধির উত্থান, বৈদেশিক কূটনীতিতে তাঁর সফলতা, 'গরিবি হটাও' স্লোগান, একাধিক সমাজতান্ত্রিক পদক্ষেপ গ্রহণ ও কর্মসূচির ঘোষণা সাধারণ মানুষের মনে তাঁর প্রতি বিশ্বাস ও ভক্তির জন্ম দিয়েছিল। কিন্তু পরবর্তী সময়ে বহু দিক থেকে ইন্দিরা-কংগ্রেসের ব্যর্থতা এবং একের পর এক দুর্নীতি সরকারের প্রতি সাধারণ মানুষের মনে ক্ষোভ সৃষ্টি করে। সংগঠিত হয় একাধিক গণ-আন্দোলন। তা দমন করতে উন্নয়নমূলক কর্মসূচির বদলে সরকার দমনমূলক পথে এগোয়। ঘোষণা করে জরুরি অবস্থা। দেশজুড়ে চলে গ্রেপ্তার, বিরোধী কণ্ঠস্বরের ওপর চাপে সেনসরশিপ। গণতন্ত্র হয় জেলবন্দি। রাজ্য-রাজনীতির ক্ষেত্রেও দেখা যায় বারংবার রাজনৈতিক ক্ষমতার পালাবদল হতে, যা সাধারণ মানুষের রোজকার জীবনকে বিভ্রান্তির মধ্যে ফেলে। একদিকে কমিউনিস্ট পার্টিগুলির মতাদর্শগত লড়াই, রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের জন্য প্রত্যেকের মরিয়া প্রয়াস আর অন্যদিকে কংগ্রেসেরও নিজের ক্ষমতাকে ধরে রাখতে আগ্রাসী মনোভাব হিংসাত্মক পরিস্থিতি তৈরি করে। পুলিশের অভিযান, সমাজবিরোধীদের আক্রমণ এবং নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘাতে ঘটতে থাকে একাধিক হত্যা ও হত্যাকাণ্ড। এক কথায়, রাজ্যবাসী নির্বিকার চোখে দেখে একটি সন্ত্রাসের দশক।

রাজনীতির এরকম দ্বন্দ্ব-সংঘাতকে কেন্দ্র করে এই দশক জুড়ে রচিত ও পরিচালিত হয়েছিল অসংখ্য নাটক। রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের বিরোধিতা নাটকে উঠে আসলে প্রতিষ্ঠানও চুপ করে বসে থাকেনি—আক্রমণ করে বা আইন দেখিয়ে সেসব নাটককে বন্ধ বা বাজেয়াপ্ত করেছে। সাতের দশকের পটভূমিতে দাঁড়িয়ে সমকালীন রাজনীতি নিয়ে লেখা নাটকগুলির মূল্যায়ন আজও প্রায় অসম্পূর্ণই। দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, উৎপল দত্ত, বাদল সরকার, মোহিত চট্টোপাধ্যায়, মনোজ মিত্র প্রমুখ কিছু নাট্যব্যক্তিত্বের নাটক ও অন্যান্য রচনা নিয়ে অবশ্যই কিছু কাজ হয়েছে। তবে সেগুলি

তাঁদের নাট্যপ্রতিভা মূল্যায়নের মধ্যেই বিশেষভাবে আবদ্ধ থেকেছে। সেই সূত্র ধরেই সাতের দশকে রচিত তাঁদের নাটকগুলির আলোচনা প্রসঙ্গে অল্পবিস্তর রাজনৈতিক দিকটি তুলে ধরা হয়েছে। বাংলাদেশের 'মুক্তিযুদ্ধ' নিয়ে বাংলাদেশের নাটককারদের রচিত নাটকগুলির আলোচনা হলেও পশ্চিমবঙ্গে রচিত বাংলা নাটকে সেই যুদ্ধ সম্পর্কে যে প্রতিক্রিয়া তা নিয়ে কোনও আলোচনার সন্ধান মেলে না। নকশাল আন্দোলনের পটভূমিতে রচিত বাংলা নাটক নিয়ে কিছু আলোচনা হয়েছে। যেমন—

১. নির্মল ঘোষের 'নকশালবাদী আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্য' গ্রন্থে সাহিত্যের অন্যান্য শাখার আলোচনার সঙ্গে কিছু নাটকের আলোচনা হয়েছে। তবে সেই আলোচনাগুলি অনেক সংক্ষিপ্ত। নকশাল আন্দোলনের রাজনৈতিক চিন্তা এবং তার বিরোধী মতের নিরিখে নাটকগুলির বিশ্লেষণ সেভাবে করা হয়নি। এছাড়াও অনেক গুরুত্বপূর্ণ নাটক সেখানে স্থান পায়নি।

২. মিলন গোপাল গোস্বামীর 'নকশালবাড়ী আন্দোলনের নাটক সমগ্র' গ্রন্থ। এখানে নাটকের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা হয়নি; বহু নাটকের কিছু কিছু অংশকেই তুলে ধরেছেন মাত্র।

৩. দেবাশিস রায়ের 'ভূমি আন্দোলন ও বাংলা থিয়েটার : দুই শতাব্দীর একটি পরিক্রমা' গ্রন্থে তেভাগা, তেলেঙ্গানা, নকশালবাড়ি এবং সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম আন্দোলনকে কেন্দ্র করে থিয়েটারচর্চা আলোচিত হয়েছে। কিন্তু এখানে নাটকের মূল্যায়নের থেকে অধিক গুরুত্ব পেয়েছে থিয়েটারের মূল্যায়ন।

৪. অংশুমান ভৌমিকের 'তীরের চিহ্নপথে কলকাতার থিয়েটার' নামে একটি প্রবন্ধে নকশাল আন্দোলনের প্রেক্ষিতে কলকাতার থিয়েটারচর্চার রূপ তুলে ধরা হয়েছে। এটিও থিয়েটারের মধ্যেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রেখেছে।

জরুরি অবস্থাকে কেন্দ্র করে রচিত বাংলা সাহিত্য নিয়ে দুটি গবেষণার সন্ধান মেলে—

১. ঐশিক দাশগুপ্তর 'বাংলা সাহিত্যে জরুরি অবস্থার প্রতিফলন'—এখানে সাহিত্যের অন্যান্য শাখা নিয়ে আলোচনা হলেও নাটক নিয়ে কোনও আলোচনা হয়নি।

২. যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ থেকে মহর্ষি সরকারের পি এচ. ডি. 'জরুরি অবস্থা ও সমকালীন রাজনৈতিক প্রেক্ষিত (১৯৭৫-১৯৭৭): নির্বাচিত বাংলা সাহিত্য'। এখানে সাহিত্যের অন্যান্য শাখার সঙ্গে কিছু নাটকের আলোচনা হয়েছে। তবে গল্প, উপন্যাস ও কবিতায় জরুরি অবস্থার প্রেক্ষিত যেভাবে দেখানো হয়েছে, নাটকের ক্ষেত্রে তা দেখানো হয়নি। সেই আলোচনা অনেকটাই সংক্ষিপ্ত।

পত্র-পত্রিকা, নির্বাচিত সংকলনে প্রকাশিত ও পাণ্ডুলিপি আকারে রক্ষিত বহু নাটক এখনও আলোচনা ও গবেষণার বাইরে থেকে গেছে। সাতের দশকের বিভিন্ন ঘটনা নিয়ে রচিত নাটক এবং সেই সময়ের নাটককারদের অবস্থান নিয়ে কিছু আলোচনা ছড়িয়ে ছিটিয়ে হয়েছে। ফলে সম্পূর্ণ সাতের দশকের বহুমুখী রাজনীতিকে কেন্দ্র করে রচিত নাটকগুলির পরিণত বিশ্লেষণের প্রয়োজন থেকেছে। সেজন্য আমাদের গবেষণায় কোনও একটি ঘটনা নয় বা কোনও নির্দিষ্ট ব্যক্তি নয় বা কোনও নির্দিষ্ট গোষ্ঠী নয়, বরং সাতের দশকের সমগ্র রাজনীতির বিভিন্ন দ্বন্দ্ব-সংঘাতে রচিত নাটকগুলির বিশ্লেষণের দিকে লক্ষ্য থেকেছে। এর মাধ্যমে আমরা যেমন ইতিহাসকে ধরতে চেয়েছি, সেই সঙ্গে তৎকালীন রাজনীতিতে সাধারণ মানুষের বিভিন্ন সমস্যা ও চেতনার অবস্থানও নাটকের মাধ্যমে তুলে ধরেছি।

বিভিন্ন নাট্যব্যক্তিত্বদের লেখালেখি, সাক্ষাৎকার, অভিজ্ঞতা সঞ্জাত স্মৃতিকথা, বিভিন্ন দলিল, পত্র-পত্রিকায় আলোচিত বিভিন্ন প্রবন্ধ থেকে সেই সময়ের নাটকের বিভিন্ন চিত্র পাওয়া যায়। সেই তথ্যগুলি সংগ্রহ ও পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণের মাধ্যমে আমাদের এই গবেষণার সার্বিক রূপ দেওয়া সম্ভব হয়েছে।

আমাদের এই গবেষণা কর্মকে যথাযথ রূপদান করতে 'প্রস্তাবনা' ও 'উপসংহার' বাদে মোট ছয়টি অধ্যায়ে বিভাজন করে নিয়েছি। আমাদের গবেষণার প্রথম অধ্যায়ের শিরোনাম 'বাংলা রাজনৈতিক নাটকের ইতিহাস : উদ্ভব থেকে বিশ শতকের ছয়ের দশক'। রাজনৈতিক নাটকের স্বরূপ কী এবং সাতের দশকের পূর্বে বাংলা নাটকের সঙ্গে রাজনীতির সম্পর্ক কীরূপ ছিল—তারই একটা পরিচয় এই অধ্যায়ে দেওয়া হয়েছে। এখানে আমরা বিভিন্ন ধারার রাজনৈতিক চেতনা ও ভাবধারা, বিভিন্ন দাবিতে গণ-আন্দোলন, রাষ্ট্রের শোষণ ইত্যাদি তুলে ধরে সেই প্রেক্ষাপটে রচিত নাটকগুলির পরিচয় দিয়েছি। এখানে প্রাধান্য পেয়েছে উনিশ শতকের সমাজসংস্কার আন্দোলন, নীলচাষ ও

নীলবিদ্রোহ, জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষ ও বিকাশ, ১৮৭৬ সালের নাট্যনিয়ন্ত্রন আইন ও ব্রিটিশ ভারতে নাটকের কণ্ঠরোধ, বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশি আন্দোলন, দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী পর্যায়ে ভারতের রাজনীতি, মহাত্মা গান্ধির সত্যাগ্রহ, ব্রিটিশ সরকারের দমন-পীড়ন, মার্কসীয় ভাবধারার প্রসার ও প্রগতি আন্দোলন, গণনাট্য সংঘের প্রতিষ্ঠা ও বাস্তব জীবনযন্ত্রণা নাটকে তুলে ধরা, ১৯৪৩-এর মন্বন্তর, স্বাধীনতা, দেশভাগ ও উদ্বাস্তু সমস্যা, স্বাধীন ভারতে নাটকের কণ্ঠরোধ, শ্রমিক-কৃষক জীবন সমস্যা এবং নির্বাচন। এই সমস্ত ঘটনা ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে নাটককাররা নিজেদের নাটককে কীভাবে রাজনীতিকরণ করেছেন সেই আলোচনাই আমাদের এই অধ্যায়ে স্থান পেয়েছে।

গবেষণার দ্বিতীয় অধ্যায়ের শিরোনাম ‘সাতের দশকের রাজনৈতিক পটভূমি’। এই অধ্যায়ে বিশ শতকের সাতের দশকের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট আলোচনা করা হয়েছে। আলোচনার সুবিধার্থে এবং স্পষ্টকরণের তাগিদে এই অধ্যায়টিকে দুটি পরিচ্ছেদে ভাগ করে নিয়েছি। প্রথম পরিচ্ছেদের নাম ‘কেন্দ্রীয় রাজনীতির প্রেক্ষিত’। এখানে দেশীয় রাজনীতি আলোচনা করতে গিয়ে দেখানো হয়েছে ভারতের রাজনীতিতে ইন্দিরা গান্ধির উত্থান এবং একমেবদ্বিতীয়াম্ নেত্রী রূপে দেশীয় রাজনীতিতে তাঁর প্রতিষ্ঠা, কংগ্রেসের ভাঙন, ইন্দিরা গান্ধির সমাজতন্ত্র, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও তাতে ভারতের অবদান, দেশীয় অর্থনীতির অবনমন, সাধারণ জনজীবনের সামাজিক ও অর্থনৈতিক মানের নিম্নগতি, গুজরাত ও বিহারের গণ-আন্দোলন, জয়প্রকাশ নারায়নের নেতৃত্বে দেশব্যাপী গণ-আন্দোলনের ডাক, সর্বোপরি জাতীয় জরুরি অবস্থার ঘোষণা এবং জরুরি অবস্থায় সেনসরশিপ, গ্রেপ্তার, পরিবার পরিকল্পনার আতঙ্ক ও নগর সৌন্দর্যায়নের উদ্দেশ্যে বস্তি উচ্ছেদ।

‘রাজ্যের (পশ্চিমবঙ্গ) রাজনৈতিক প্রেক্ষিত’ শিরোনামের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে স্থান পেয়েছে ‘যুক্তফ্রন্ট’ সরকার ও তার পতন, একাধিকবার রাষ্ট্রপতি শাসন জারি, নকশাল আন্দোলনের উত্থান ও তার রাজনৈতিক চিন্তা, সি. পি. আই. (এম. এল.)-এর প্রতিষ্ঠা, নকশাল আন্দোলনকে দমন করতে পুলিশ-প্রশাসনের অতিসক্রিয়তা, সরকার পোষিত গুন্ডাদের অত্যাচার, বারাসাত, কাশিপুর, বরানগরের হত্যাকাণ্ড, ১৯৭২-এর নির্বাচন ঘিরে রাজনৈতিক সন্ত্রাস, সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের মুখ্যমন্ত্রিত্বে কংগ্রেসি আমল, জরুরি অবস্থায় পশ্চিমবঙ্গের পরিস্থিতি।

রাজনৈতিক নাটকের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য আন্তর্জাতিক কণ্ঠস্বর। বিশ্বের যে কোনও প্রান্তে যদি কোনও জাতি বা গোষ্ঠী বা দেশ অন্য কোনও জাতি বা গোষ্ঠী বা দেশের দ্বারা শোষিত, অত্যাচারিত, নিপীড়িত হয়ে থাকে তাহলে রাজনৈতিক নাটককাররা শোষিত-অত্যাচারিত-নিপীড়িতদের পাশে থাকে। সেই সূত্র ধরেই আমাদের তৃতীয় অধ্যায়ের অবতারনা। এই অধ্যায়টি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে কেন্দ্র করে পশ্চিমবঙ্গের নাটককারদের অবস্থান নিয়ে রচিত। অধ্যায়ের শিরোনাম 'পশ্চিমবঙ্গের নাটকে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রতিফলন'। ১৯৪৭ সালে দেশভাগ করে ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি দেশ স্বাধীন হয়। কিন্তু ১৯৭১ সালে গিয়ে পাকিস্তান পুনরায় বিভাজিত হয়ে পূর্ব-পাকিস্তান বাংলাদেশ নামে নতুন রাষ্ট্রের স্বীকৃতি পায়। স্বাধীনতার পর থেকেই এর ক্ষেত্র তৈরি হয়েছিল। যার পিছনে মূল কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল পশ্চিম-পাকিস্তানের দ্বারা পূর্ব-পাকিস্তানকে শোষণ এবং পশ্চিম-পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদ। পূর্ব-পাকিস্তান (বাংলাদেশ)-এর প্রতি পশ্চিম-পাকিস্তান সর্বত্র ঔপনিবেশিক শাসকের মতো আধিপত্য করেছে। তাদের ভাষার স্বাধীনতা খর্ব করেছে, মৌলিক অধিকার দমন করেছে, অর্থনৈতিক সাহায্যে বৈষম্য দেখিয়েছে, এমনকি রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করতেও বাধা দিয়েছে। ফলে পূর্ব-পাকিস্তানের বাঙালি মুসলিমদের পশ্চিম-পাকিস্তানের পাঞ্জাবি মুসলিমদের প্রতি ক্ষোভ জন্ম নেয় অনেক আগে থেকেই—১৯৫২ সালে ভাষার স্বাধীনতা অর্জনে সংগঠিত হয় রক্তক্ষয়ী 'ভাষা আন্দোলন'। আর এই ক্ষোভের শেষ পরিণতি হয় ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ। মুক্তিযুদ্ধ সংগঠিত হয়েছিল সীমায়িত বাংলা ভূ-খণ্ডে নিজেদের অধিকার অর্জনের জন্য। আর সে জন্যই বাংলাদেশ নিবাসীরা নিজেদের স্বাধীন করতে সশস্ত্র সংগ্রামে পা বাড়িয়েছিল। গঠন করেছিল 'মুক্তিবাহিনী'। তাদের দমন করতে পাকিস্তান শাসক ও সামরিক বাহিনী বাংলাদেশের বাঙালিদের ওপর শারীরিকভাবে প্রবল নির্যাতন করে, নারীদের ধর্ষন করে, নির্বিচারে হত্যালীলা চালায়। প্রাণের দায়ে লক্ষ লক্ষ মানুষ ভারতে আশ্রয় নেয়।

মুক্তিযুদ্ধের অনুষঙ্গ নিয়ে বাংলাদেশে বহু গুরুত্বপূর্ণ নাটক রচনা হয়েছে। কিন্তু আমাদের গবেষণা সম্পূর্ণরূপে পশ্চিমবঙ্গের নাট্যচর্চার মধ্যেই আবদ্ধ; বাংলাদেশের নাটক এখানে আলোচিত হয়নি। সেজন্যই এখানে আমরা আলোচনা করেছি উৎপল দত্তর 'ঠিকানা' ও 'জয় বাংলা', দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়র 'দুরন্ত পদ্মা', অনিল দের 'দূর্বার

বাংলা', স্বপন কুমার মিত্রর 'মুক্তির রাইফেল' এবং পানু পালের 'বাঁচার শপথ' এই ছয়টি নাটক। পশ্চিমবঙ্গে এই নাটকগুলি লেখা হয়েছিল মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন। মুক্তিযুদ্ধ সমাপনের পর বাংলাদেশের নাগরিকের বিজয় ঘোষিত হয়। কিন্তু সেই বিজয়গাথা নিয়ে পশ্চিমবঙ্গে কোনও নাটক রচিত হয়েছে বলে তেমন কোনও প্রমাণ মেলে না।

রাজনৈতিক নাটককারদের রাজনৈতিক অবস্থান থাকা জরুরি। রাজনৈতিক নাটক কোনও নির্দিষ্ট রাজনৈতিক লাইনের হয় সমর্থন করবে নয় তো তার বিরোধিতা করবে, তুলে ধরবে সেই লাইনের লক্ষ্য, পন্থা ও বিচ্যুতি। সাতের দশকের রাজনীতির ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোড়ন ছিল নকশাল আন্দোলন। আমাদের চতুর্থ অধ্যায়ের বিষয় এই আন্দোলনকে কেন্দ্র করে রচিত নাটকের বিশ্লেষণ। এই অধ্যায়ের শিরোনাম 'নকশাল আন্দোলনের পটভূমিতে রচিত বাংলা নাটক'। বিশ শতকের সাতের দশকে পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের রাজনীতিতে সব থেকে বেশি প্রভাব বিস্তার করেছিল নকশাল আন্দোলন। যার প্রভাব নাটককার মহলেও পড়েছিল প্রবলভাবে। নকশাল আন্দোলন নিয়ে বাংলায় যে পরিমাণ নাটক লেখা হয়েছে অন্য কোনও আন্দোলন বা রাজনৈতিক ঘটনা নিয়ে সেই সংখ্যক নাটক লেখা হয়েছে বলে মনে হয় না। সেই সমস্ত নাটকগুলি থেকে কিছু নাটক নির্বাচিত করে আমাদের এই অধ্যায় সমাপন হয়েছে। যেসব নাটকগুলি নকশাল আন্দোলনের রাজনৈতিক চিন্তার বিশ্লেষণ করেছে, বিভিন্ন ঘটনার ব্যাখ্যা ও বিবরণ দিয়েছে, আন্দোলনের প্রসারে বিশেষ ভূমিকা রেখেছে, আন্দোলনের ত্রুটি-বিচ্যুতি তুলে ধরেছে সেই সব নাটকগুলিকেই এখানে স্থান দেওয়া হয়েছে। এমনকি যে নাটকগুলি নকশাল রাজনীতির বিরোধিতা করেছে সে নাটকগুলিও এখানে স্থান পেয়েছে। এই অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে উৎপল দত্তের 'তীর', মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের 'রাজরক্ত', বিজন ভট্টাচার্যের 'চলো সাগরে', অসিত বসুর 'কলকাতার হ্যামলেট', অমল রায়ের (আসল নাম তপন দাস) 'দালাল', 'আটজোড়া খোলা চোখ', 'দুই চোরের গপ্পো', 'পঙ্কজদত্ত আসছেন', 'যেখানেই অত্যাচার', মনোরঞ্জন বিশ্বাসের 'পদাতিক', সমীর চক্রবর্তীর 'স্টেডিয়াম নেই, হাততালি নেই', দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মেঘের আড়ালে সূর্য', শুকদেব চট্টোপাধ্যায়ের 'ঝড়ের পাখি', বাদল সরকারের 'ভোমা', 'নাট্যকারের সন্ধানে তিনটি চরিত্র', 'লক্ষ্মীছাড়ার পাঁচালী'।

সামাজিক অবনমন, স্বেচ্ছাচারিতা, সন্ত্রাসকে রাজনৈতিক নাটক বরদাস্ত করে না। সাতের দশকের রাজনৈতিক সন্ত্রাস সমাজ জীবনকে অন্ধকারে নিক্ষেপ করেছিল। বিভিন্ন রাজনৈতিক লাইনগত দলাদলি, ক্ষমতা দখলের উন্মত্ততা, সরকারের মদতপুষ্ট গুন্ডাদের বাড়বাড়ন্ত সাতের দশকে সামাজিক অবক্ষয় নিয়ে আসে। সেই সূত্রেই আমাদের পঞ্চম অধ্যায় 'সাতের দশকের রাজনৈতিক সন্ত্রাসের চিত্র বাংলা নাটকে'-এর গঠন। সাতের দশকের রাজনীতিতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যে ক্ষমতা দখলকে কেন্দ্র করে ছড়িয়ে পড়েছিল রাজনৈতিক সন্ত্রাস। নকশাল ও সি. পি. আই. (এম)-এর মধ্যে চলেছিল মতাদর্শগত লড়াই; যা পরিণতিতে হিংসাত্মক পর্যায়ে পৌঁছায়। একে অপরের সংঘাতে খুন হয় একাধিক নেতা-কর্মী-সমর্থক। এই প্রবণতা বৃদ্ধি পায় দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতনের পর থেকে। রাষ্ট্রপতি শাসন, কংগ্রেসের ক্ষমতা দখলের পর রাজনৈতিক পরিবেশ আরও ভয়াবহ হয়ে ওঠে। প্রত্যেকেই চায় প্রত্যেককে দমন করতে। পুলিশি অভিযান ও কংগ্রেসি গুন্ডাদের আক্রমণ বহু মানুষের প্রাণ নিয়ে নেয়। যেখানে-সেখানে পড়ে থাকে লাশ, জেলের ভিতর রাজনৈতিক বন্দিদের ওপর চলে অকথ্য অত্যাচার। বারাসাত-কাশীপুর-বরানগর হত্যাকাণ্ড ঘটে। শিল্পাঞ্চলেও চলে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি। বেকারত্ব, রাজনৈতিক হিংসা, গ্রেপ্তার ছিল এই সময়ের চরম সত্য। বাংলা নাটকে তার প্রতিফলন পড়েছে চরমভাবে। এই অধ্যায়ে আমরা আলোচনা করেছি উৎপল দত্তের 'ব্যারিকেড', 'দুঃস্বপ্নের নগরী', বাদল সরকারের 'মিছিল', 'বাসি খবর', অমল রায়ের 'লাসবিপণি', 'শববাহকেরা', অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'হে সময়, উত্তাল সময়', অসিত ঘোষের 'সংগ্রাম', 'নাজি '৭৪'।

রাজনৈতিক নাটক সর্বদাই ব্যক্তিপূজা ও একনায়কতন্ত্রের বিরোধিতা করে। সাতের দশকের রাজনীতিতে সেরকমই একটা নিদর্শন পাওয়া যায় জরুরি অবস্থা ঘোষণার মধ্যে। এই জরুরি অবস্থাকে বিষয় করেই আমাদের ষষ্ঠ অধ্যায় 'বাংলা নাটকে জাতীয় জরুরি অবস্থার পটভূমি' রচিত। কেন্দ্রীয় সরকার ঘোষিত সাতের দশকের জাতীয় জরুরি অবস্থা দেশের জাতীয় জনজীবনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। মৌলিক অধিকার খর্ব, নির্বিচারে গ্রেপ্তার, সেনসরশিপ, পরিবার পরিকল্পনার নামে অপরিকল্পিত নির্বীজকরণ হয়ে ওঠে গণতন্ত্রের প্রতিবন্ধক। সমস্ত কিছুই নির্ভর করে কেন্দ্রীয় সরকারের ইচ্ছার উপর। এক কথায় দেশের গণতন্ত্র হয়ে যায় জেলবন্দি। দেশের মানুষের কাছে প্রতিবাদের কোনও

উপায় থাকে না। সমস্ত কিছুর উপর চলে সরকারি নজরদারি। নাটক ও থিয়েটার তার বাইরে থাকে না। নাটককারেরা নাটক অভিনয় করতে গিয়ে পুলিশি বাধার সম্মুখীন হন। ফলে জরুরি অবস্থার পটভূমিকে বিষয় করে খুব বেশি নাটক রচনা ও পরিচালনার সুযোগ সেই সময়ে হয়নি; তবে একেবারেই যে লেখা হয়নি তা নয়। এমন বেশকিছু নাটক পাওয়া যায় যেগুলি জরুরি অবস্থার জটিল রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে তুলে ধরেছে এবং তার প্রতিবাদও করেছে। যেমন উৎপল দত্তের 'লেনিন কোথায়?', 'এবার রাজার পালা', 'সাদা পোশাক', অমল রায়ের 'নিজবাসভূমি', 'বদলা', দিব্যেশ লাহিড়ীর 'নানা হে', মনোজ মিত্রের 'নরক গুলজার', বিমল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'উত্তর মেলে না', অমলেন্দু চক্রবর্তীর 'দেশটা যখন কারাগার', অসীম মৈত্রর 'ঢাকের বাদ্যি'। এইসব নাটকের আলোচনা এই অধ্যায়ে আবদ্ধ।

আলোচিত এই ছয়টি অধ্যায়ের বক্তব্য থেকে প্রাপ্ত সাতের দশকের রাজনৈতিক পটভূমিতে রচিত নাটকগুলি কোথায় নিজের স্বাতন্ত্র্য ও সফলতা বজায় রেখেছে সেই বিষয়টি গবেষণার সপ্তম অধ্যায় 'উপসংহার'-এ আলোচিত হয়েছে।

আমাদের গবেষণায় ব্যবহৃত নাটকগুলি যেসব গ্রন্থ ও নাট্যপত্রিকা থেকে পাওয়া গেছে তার একটি তালিকা গবেষণা কর্মের অন্তিমে 'গ্রন্থপঞ্জি' অংশে দেওয়া হয়েছে। সেই সঙ্গে গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন করতে যে সমস্ত গ্রন্থ, পত্র-পত্রিকা, দৈনিক পত্র, আন্তর্জালিক মাধ্যমের সহায়তা নেওয়া হয়েছে তার তালিকাও সেখানে প্রদান করা হয়েছে। আমাদের এই গবেষণাকর্মটি বর্ণনামূলক ও ব্যাখ্যামূলক গবেষণা পদ্ধতিতে সম্পূর্ণতা লাভ করেছে। সমগ্র গবেষণা কর্মটিতে এম. এল. এ. (MLA) রীতি অনুসৃত এবং বানানের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির 'আকাদেমি বানান অভিধান'-এর নিয়ম মান্যতা পেয়েছে।